নতুন সরকারি বেতন কাঠামো ও যৌক্তিক প্রত্যাশা

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো আসছে জানুয়ারি মাসেই। এটি মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করা হবে কী?... পর্যালোচনা করেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

দীর্ঘ সাত বছর পর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন কাঠামো সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদের সাবেক সচিব এম মুজিবল হককে প্রধান করে গঠিত হয়েছে জাতীয় কমিশন। কমিশন নতুন বছরের শুরুতেই মানে ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে নতুন একটি বেতন কাঠামো প্রস্তাব করবে। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত করবে। ধারণা করা হচ্ছে, নতুন কাঠামো অনুসারে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রচলিত কাঠামোর তুলনায় উল্লেখযোগ্যহারে বাড়বে।

আসলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর দাবিটি দিনকে দিন জোরালো হয়ে উঠেছে যৌক্তিক কারণেই। যদিও হাজারটা অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে ঘুষ, দুর্নীতি, অসততা ও অদক্ষতার। সরকারি কর্মকর্তা মানেই হয় ঘুষখোর, না হয় অদক্ষ– এমন একটি বিভ্রান্তিকর ধারণা সমাজের মধ্যে গেড়ে বসেছে। এই অভিযোগের খানিকটা সত্যতা থাকলেও ঢালাওভাবে বলার কোনো সুযোগ আসলে নেই।

'এটা খুবই দুঃখজনক যে লোকজন আমাদের গণহারে দুর্নীতিবাজ বলে'- বললেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র সহকারী সচিব। 'আমরা কেউই দুর্নীতি করতে চাই না। কেউ কেউ যে অসৎ উপায়ে বাড়তি আয়ের চেষ্টা করে সেটাও আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু যে বেতন-ভাতা আমরা পাই তাতে কিভাবে আমাদের দিন চলে তা কি আপনারা কখনো চিন্তা করে দেখছেন?'

আসলেই কেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অসৎ বা অদক্ষ তার কারণ খোঁজার ও তা প্রতিকারের কোনো প্রচেষ্টা কখনোই করা হয়নি। অনেকেই বলে থাকেন যে যেহেতু তারা অসৎ ও অদক্ষ, সেহেতু তাদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু এধরনের যুক্তি আসলে কূটযুক্তি।

'সারা দিন অফিস করে বাসায় ফিরেও ভালমতো বিশ্রাম করতে পারি না'- বললেন পরিকল্পনা কমিশনের একজন সহকারী প্রধান। 'সন্ধ্যার পর ছাত্র পড়াই। না হলে এই দুর্মূল্যের বাজারে চলবো কিভাবে?'

এই দু'জন সরকারি কর্মকর্তার বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাদেরকে যে বেতন-ভাতা দেয়া হয়, তা অপ্রতুল। কেউ কেউ অবশ্য এমনও বলে থাকেন, যারা সরকারি চাকরিতে আসছেন, তারা জেনেশুনেই আসছেন যে বেতন-ভাতা কম। আর তাই বেতন কম বলে কাজ ঠিকমতো করবেন না সেটা গ্রহণীয় হতে পারে না।

'যারা এসব কথা বলছে তাদেরকে বলুন না আমাদের ভাল বেতনে চাকরি জোগাড় করে দিতে'- পাল্টা বললেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র সহকারী প্রধান।

অবশ্য ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগ সবচেয়ে বেশি পুলিশের বিরুদ্ধে। 'এটা ঠিক, আমরা যারা পুলিশে চাকরি করি, তারা কম-বেশি ঘুষ খাই'- সহাস্যে বললেন একজন এএসপি। 'কিন্তু কাউকে তো ঘুষ দিতে হয়। তারা ওটা দেন কেন? আগ বাড়িয়ে ঘুষ দেবেন আপনি আর সমস্ত দোষ হবে আমাদের, এটা কেমন কথা? পারলে আপনারা একজোট হয়ে ঘুষ দেয়া বন্ধ করুন না।'

ঘুষ-দুর্নীতির বিষয়টাও যে একতরফা কোনো ব্যাপার নয়, তা আমাদের সবার জানা। আমরা যারা ঘুষ দেই তারা বলি যে নিরুপায় হয়ে দেই, না হলে কাজ হবে না। আর এটা দিতে গিয়েও চলে প্রতিযোগিতা। যার আর্থিক সামর্থ্য বেশি সে বেশি দিয়ে আগে কাজ বাগিয়ে নেয়।

প্রকৃত বেতন কত?

১৯৯৭ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় বেতন কাঠামো সংশোধন করে। এরপর গত সাত বছর ধরে এটাই চলে

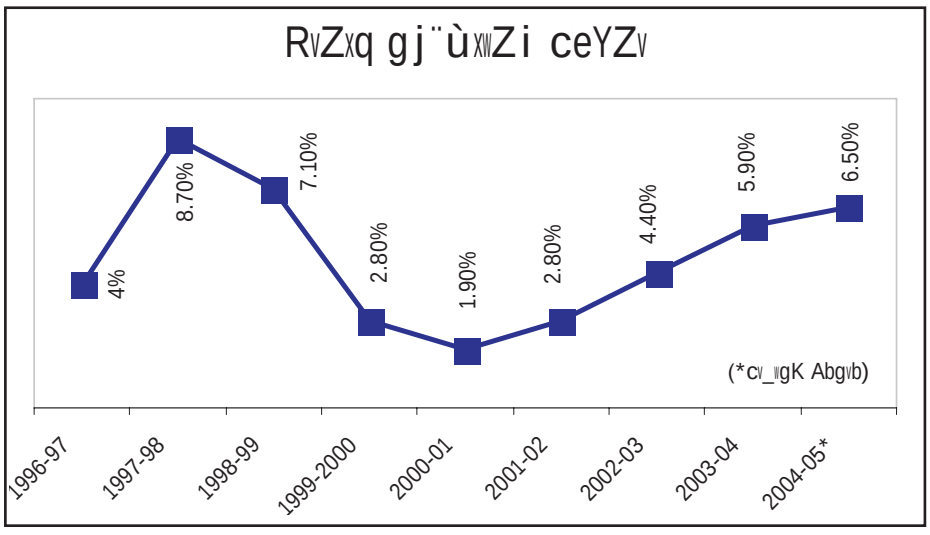

আসছে। তবে এই সাত বছরে মূল্যস্ফীতির হারের সঙ্গে সমন্বয় করলে দেখা যায়, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রকৃত আয় প্রায় ৪০% কমে গেছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ হিসেব দিয়ে বলেছে যে, ১৯৯৭ সালের বেতন কাঠামোয় একজন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা নতুন কাজে যোগদানের পর সর্বসাকুল্যে বেতন পান ৬,৫২৫ টাকা। সাত বছরের মূল্যস্ফীতির হারের সঙ্গে হিসাব করলে আসলে ২০০৪ সালে তিনি পাচ্ছেন মাত্র ৩,৯৫২ টাকা। কারণ, মূল্যস্ফীতি বা দ্রব্য ও সেবামূল্য বেড়ে যাওয়ায় ১৯৯৭ সালে তিনি ৬,৫২৫ টাকা ব্যয় করে বাজার থেকে যা ক্রয় করতে পারতেন, এখন আর তা পারছেন না। বরং একই অর্থ ব্যয় করে তিনি এখন ২,৫৭৩ টাকার জিনিস কম পাবেন। সিপিডি আরো হিসাব করে দেখিয়েছে, প্রচলিত বাজার মূল্য অনুসারে ঐ কর্মকর্তার এখন সর্বসাকুল্যে বেতন হওয়া উচিত ৯,১০০ টাকা।

এই একটি হিসাবই কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেয়, অবস্থা কতোটা নাজুক। এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় যে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী একটা ছেলে বা মেয়ে কষ্ট করে বিসিএস দিয়ে চাকরিতে ঢুকে যা বেতন পাচ্ছে, তা দিয়ে ঢাকা শহরে তার ঘর ভাড়া দিতেই অর্ধেকটা চলে যাচ্ছে। একজন মানুষের বাড়িভাড়া ও খাওয়া খরচ যোগাতেই যদি পুরো বেতন চলে যায়, তাহলে তার পোষাবে কিভাবে? ন্যূনতম সুস্থ-সুন্দর জীবন ধারণ করতে না পারলে তার কাছ থেকে ভালো কাজ আশা করা যাবে কিভাবে?

সমাধান মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয়!

নতুন বেতন কাঠামোর জন্য পে-কমিশন বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সংগঠন বিসিএস ইকোনমিক ক্যাডার এসোসিয়েশন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করেছে।

অর্থনৈতিক ক্যাডার সমিতি বলেছে, বেতন কাঠামো এমন হওয়া উচিত যেন বেতনভোগীদের প্রকৃত আয় মূল্যস্ফীতির বিপরীতে সংরক্ষণ করা যায়। আর এটি করার জন্য তারা মূল্যস্ফীতির সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেতন সমন্বয় করার কথা বলেছে।

'এটি কোনো অযৌক্তিক বা অবাস্তব দাবি নয় বরং পৃথিবীর বহু দেশে এ ব্যবস্থা আছে'- বললেন ক্যাডারভুক্ত একজন কর্মকর্তা। 'এর ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যেমন দুশ্চিন্তামুক্ত থাকবেন, তেমনি সরকারও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট থাকবেন।'

সমিতির সুপারিশে বলা হয়েছে, বেতন কাঠামো এমন হওয়া উচিত যেন চার সদস্যের পরিবার নিয়ে একজন মানুষ ন্যূনতম মানসম্পন্ন জীবন ধারণ করতে পারে। এর পক্ষে যুক্তি দিয়ে সুপারিশে বলা হয়েছে, জীবনযাত্রার মান যদি উন্নত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং সার্বিকভাবে জাতীয় কর্মকান্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি হবে।

'অনেকেই আমাদের সম্পর্কে বলে থাকেন যে আমরা বেতন-ভাতা'র বাইরেও যেসব সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতা ভোগ করি, সেগুলো হিসাব করলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রকৃত আয় নাকি অনেক বেশি হয়ে যায়'- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আরেকজন সিনিয়র সহকারী সচিব বললেন এ কথা। 'কিন্তু এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। নিচের দিকের কর্মকর্তারা খুব কমই সুযোগ-সুবিধা পান।'

সুপারিশে বাসস্থানের জন্য কোয়ার্টার বরাদ্দের চেয়ে বরং নগদ অর্থ প্রদানের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বাসস্থানের জন্য সরকারকে এমনিতেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এরপরও সবার জন্য বাসস্থান সংকুলান সম্ভব নয়, বিশেষ করে ঢাকায়। একইভাবে পরিবহন সুবিধার ক্ষেত্রেও গাড়ি বরাদ্দের বিকল্প হিসেব নগদ

অর্থনীতির দুটি অপ্রত্যাশিত ও একটি কাম্য চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে বন্যা ও তেলের দর বৃদ্ধিকে অপ্রত্যাশিত এবং কোটা উঠে যাওয়াকে কাম্য চ্যালেঞ্জ হিসিবে চিহ্নিত করা হয়েছে... লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

সবারই জানা আছে যে চলতি অর্থ-বছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি ধাক্কা আসবে। সেটা হলো, ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কোটামুক্ত বিশ্ববাজারে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পের তীব্র প্রতিযোগিতার সূচনা। তবে এই প্রত্যাশিত ধাক্কাটি আসার আগেই বাংলাদেশের অর্থনীতি দু'টি অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খেয়েছে। একটি অভ্যন্তরীণভাবে, অন্যটি আন্তর্জাতিকভাবে। জুলাই-আগস্ট মাসে যে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল তা নিঃসন্দেহে অর্থনীতিতে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা বড় ধরনের চাপ তৈরি করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এই তিনটি বিষয়কে চলতি অর্থবছরসহ মধ্য মেয়াদে অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গত ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে (২০০৩-০৪) এ তিনটি বিষয়ের প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বন্যায় আসলে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল, তার কোনো সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হিসেব সরকার দিতে পারেনি। জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সাহায্য চাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করে সরকার প্রথমে একটা হিসেব প্রস্তুত করে। তাতে দাবি করা হয় যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৪০ হাজার কোটি টাকার ওপরে। কিসের ভিত্তিতে এ হিসেব করা হয়েছিল তার কোনো সদুত্তর মেলেনি। তবে একই সময়ে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) নিজস্ব মাঠ জরিপ ও সরকারি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে হিসেব দেয় যে, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ১২-১৩ হাজার কোটি টাকার মতো হবে। এ নিয়ে সরকার অবশ্য বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তবে জাতিসংঘ যখন মাত্র ২১০ মিলিয়ন ডলার বা ১২০০ কোটি টাকার আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন জানায়, তখনই বোঝা যায় সরকারের হিসেব তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক, এডিবিসহ দাতাগোষ্ঠী মাঠ জরিপ করে হিসেব দেয় বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ১৫-১৬ হাজার কোটি টাকা, তখন আবারও প্রশ্ন দেখা দেয় সরকারের বিশাল ক্ষয়ক্ষতির হিসেব দেখানো নিয়ে। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে বলে সাহায্য পাওয়ার দিন যে অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে সেটা সম্ভবত সরকার ভুলে গেছে। বিশ্বব্যাংক ও এডিবির হিসেব ছিল বন্যায় চলতি উৎপাদনের ক্ষতি জিডিপির ১.৫% আর সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি জিডিপির ২.৩%। ফলে বন্যার কারণে চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০০৩-০৪ অর্থবছরে অর্জিত প্রবৃদ্ধির (৫.৫%) চেয়ে ০.৫% কম হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্য এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে দ্বিমত করে বলেছে যে যতোটা আশঙ্কা করা হচ্ছে, অর্থনীতিতে

অর্থনীতি সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বাভাস

- বন্যার ক্ষয়ক্ষতির সীমিত প্রভাব পড়বে।
- তেলের দর বৃদ্ধিতে ৩০ কোটি ডলার বাড়তি ব্যয় হতে পারে।
- রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির বিপর্যয় রোধ করবে।
- মূল্যস্ফীতির হার ৬.৫%-এ উঠলেও দ্রুত নেমে আসবে।
- মধ্য মেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
- বিনিয়োগের জন্য অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের দিকে জোর দিতে হবে।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য গত সেপ্টেম্বরে ব্যারেল প্রতি ৫০ ডলার অতিক্রম করে যায়। বাংলাদেশ ব্যাংক হিসেবে করে বলেছে যে এটি চাপ তৈরি করলেও বাংলাদেশের পক্ষে ব্যয় ব্যবস্থপনা অসম্ভব নয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের ১০%-এরও কম ছিল অশোধিত তেল ও তেলজাত পণ্য। এজন্য ব্যয় করতে হয়েছিল ৯৮০ কোটি ডলার। তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে গড়ে ৩০% দর বৃদ্ধি ধরলে এ বছর আরো ৩০০ কোটি ডলার অতিরিক্ত ব্যয় হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এই পরিস্থিতিতে পরিবহন ও বিদ্যুৎ খাতে তেলের বিকল্প হিসেবে গ্যাস ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

প্রশ্ন থেকে যায়, কেন বন্যা ও তেলের মূল্য বৃদ্ধি অর্থনীতিতে সীমিত প্রভাব পড়বে? অথবা অন্যভাবে বললে, কিভাবে এ দু'য়ের নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ওঠা যাবে? বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে, রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি আয়ের এই ধাক্কা সামলাতে অর্থনীতিকে সহযোগিতা করবে। প্রথম তিন মাসের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও অন্যান্য সূচকের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করছে চলতি বছর রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছে যাবে। ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি চলতি বছরের ৬% লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ০.২৫% থেকে ০.৫০% পর্যন্ত কম হতে পারে।

তবে আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ে। তেলের দর বৃদ্ধির প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের আয়ের ওপর পড়বে। জ্বালানি পণ্য ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্রের দামও বাড়বে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক আশা করছে যে মূল্যস্ফীতি বেশিদূর অগ্রসর হবে না, বাস্তবতা সেরকম না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

অন্যদিকে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের বহুল আলোচিত কোটা-সুবিধা উঠে গেলে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের প্রতিযোগিতাশীলতা অনেক বেড়ে যাবে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লেখ করেছে। ফলে, লেনদেনের ভারসাম্য, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তবে এটি কাটিয়ে ওঠার জন্য বন্দর, অবকাঠামো ও উপযোগ উন্নতকরণ, লিড টাইম হ্রাস, পশ্চাদমুখী সংযোগ শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধার প্রয়াস চালানোর কথা বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে ব্যাংক মনে করে, কোটা সুবিধা উঠে যাওয়া চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি সুযোগও তৈরি করেছে। পণ্য রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং রপ্তানি গন্তব্য শুধু পশ্চিমা বিশ্বে সীমিত না রেখে তা সম্প্রসারণ করা এবং সাফটা ও বিমসটেকের আওতায় আঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়ানো হবে মধ্য মেয়াদে বাংলাদেশের জন্য ফলপ্রসূ কাজ।

মাস্টার্স ডিগ্রিধারী একটা ছেলে বা মেয়ে কষ্ট করে বিসিএস দিয়ে চাকরিতে ঢুকে যা বেতন পাচ্ছে, তা দিয়ে ঢাকা শহরে তার ঘর ভাড়া দিতেই অর্ধেকটা চলে যাচ্ছে। একজন মানুষের বাড়িভাড়া ও খাওয়া খরচ যোগাতেই যদি পুরো বেতন চলে যায়, তাহলে তার পোষাবে কিভাবে? ন্যূনতম সুস্থ-সুন্দর জীবন ধারণ করতে না পারলে তার কাছ থেকে ভালো কাজ আশা করা যাবে কিভাবে?

অর্থ দেয়ার বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য বলা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্যাডারের সুপারিশের দু'টি উল্লেখযোগ্য দিক আছে- প্রথমত, মূল বেতন কাঠামো টাকার অঙ্কে কী হওয়া উচিত তার কোনো সুপারিশ করা হয়নি বরং বিষয়টি কমিশনের প্রজ্ঞার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদে সরকারি ব্যয় সাশ্রয়ের কিছু পরামর্শও দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত জনবল ছাঁটাই করার কথা এবং কাজের পরিধি এমনভাবে নির্ধারণ করা যেন একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিজেই আনুষঙ্গিক কাজগুলো করে নিতে পারে। যেমন- কম্পিউটার চালানোর জন্য বাড়তি লোক নিয়োগ না দেয়া।

এছাড়া বিভিন্ন ধরনের জমে থাকা পুরনো সম্পদ যেমন পুরনো গাড়ি, পুরনো বাড়ি বিক্রি করে দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

উর্ধ্বতন আমলারাই বাধা

যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও কেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সময় সময় পুনর্বিন্যাসিত হয়নি? কারণ খুঁজতে গিয়ে একটি মজার তথ্য জানা গেছে। বিভিন্ন সময়ে উচ্চ পদস্থ আমলারা মানে সচিব, অতিরিক্ত সচিব এরাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন এই বেতন-কাঠামো সমন্বয় করার। বিশেষ করে পাকিস্তান আমলের যেসব সিএসপি অফিসার দীর্ঘদিন উচ্চপদে থেকেছেন, তারা কখনোই চাননি যে নিচ থেকে ধারাবাহিকভাবে যোগ্য আমলা গড়ে উঠুক। বরং তারা চেয়েছেন সরকার ও প্রশাসন যেন তাদের ওপরই নির্ভরশীল থাকে। এ কারণে এরা নিচের দিকের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন রকম হয়রানি ও হতাশার মধ্যে ডুবিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। আর নিজেদের জন্য বাড়ি-গাড়ি, বিদেশ সফর, বিদেশী অর্থায়নে প্রকল্পসহ নানা সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে এক ধরনের বৈষম্যমূলক অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে পরবর্তীতে যারা আবার উপরের দিকে উঠে এসেছেন, তারাও আবার তখন ঐসব বাড়তি সুবিধা পেয়ে নিচের দিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কথা ভুলে গেছেন। শুধু তাই নয়, এরাই বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে লাগিয়ে রেখেছে। ফলে ক্যাডার বৈষম্য ও বিভেদ চরম আকার ধারণ করেছে। গোটা আমলাতন্ত্র শাসন ক্ষমতার কার্যকর হাতিয়ার হওয়ার পরিবর্তে এখন যন্ত্রণার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আর এর মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়েছে দুর্নীতি ও অদক্ষতা। যারা নতুন এখানে প্রবেশ করছেন সুস্থ-সুন্দর মানসিকতা নিয়ে, কিছুদিন যেতে না যেতেই হতাশা গ্রাস করছে তাদের। হতাশা কাটাতে কেউ অন্যায় পথে পা বাড়াচ্ছেন, কেউ কেউ হয়ে পড়ছেন নিষ্ক্রিয় ও অদক্ষ। আর এর জের টানতে হচ্ছে গোটা দেশের মানুষকে।